নবুয়ত
ও
বেলায়ত

রচনায়
শায়খ মুহাম্মদ মুহি উদ্দীন আযহারী
প্রধান, পোর্টসমাউথ ইসলামিক সেন্টার, ইউ.কে
খতিব, পোর্টসমাউথ জামে মসজিদ, ইউ.কে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**মহা মানব নিখিল ধরনির মুক্তি তরনী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা
আহমদ মুজতাবা (সঃ) এঁর প্রতি পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার
নিকট হইতে দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত
হইয়াছিলো।
একটি নবুয়ত, অপরটি বেলায়ত।**

খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী
(রহঃ)

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, "মনে রেখো যারা আল্লাহর ওলী (বন্ধু), তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে"। আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জনের এই বিষয়টি তাসাউফের পরিভাষায় বেলায়ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই ধারা (বেলায়ত) নবুয়তের ছায়া। হযরত রাসুল (স:) এর স্বত্তার দুটি গুনজ বিকাশ ছিল। একটি তার রেসালত সংশ্লিষ্ট নবুয়তি স্বত্তা। অপরটি খোদার নৈকট্য লাভের সাথে সম্পর্কিত বেলায়তি স্বত্তা। এই দুটি স্বত্তার মাঝে রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একটির অস্তিত্যে অন্যটিকে ছাড়া কল্পনাও করা যায়না। হযরত মুহাম্মদ (স:) ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী; শেষ নবী। তার পর আর কোন নবী আসবে না বা আসার প্রয়োজন নেই। তার মাধ্যমে নবুয়তের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। তার অপর স্বত্তা যা বেলায়তি ধারায় বিকশিত আবহমান কাল পর্যন্ত জারী থাকবে। নবুয়ত ও বেলায়তের বিভিন্ন দিক ও আঙ্গিক রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে শুধুমাত্র নবুয়ত ও বেলায়তের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বেলায়ত

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে একদলকে নির্দিষ্ট করেছেন। তারা তাকে ভালোবেসেছেন। তিনিও তাদেরকে ভালোবেসেছেন[১]। তারা বিশেষভাবে বিশেষায়িত একটি দল। কোরআনের পরিভাষায় এই দলকে ওলী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তাদের এই বিশেষ গুণকে বেলায়ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দগত দিক থেকে 'বেলায়ত' (الولاية) শব্দটির মৌলিক অর্থ কয়েকটি হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে নৈকট্য (القرب)। এই অর্থটি তুলনামুলকভাবে বেশি প্রচলিত। অপরটি হচ্ছে কোন কিছুর দায়িত্ব নেয়া (تولى الأمر)। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে উভয় অর্থেই 'বেলায়ত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একই শব্দমুল থেকে ওলী (ولى) শব্দটি উৎসারিত। মূল আদ্যাক্ষর (و - ل - ى)। বহু বচন আওলিয়া (اولياء)। বাংলায় এই শব্দটি সরাসরি (ওলী বা অলী) ব্যবহার হয়ে আসছে। অনেক কথা সাহিত্যিক এই শব্দের বাংলা প্রতিরূপ হিসেবে 'ঋষি' শব্দ ব্যবহার করলেও ওলী শব্দের মাঝে বিদ্যমান ভাষাগত গভীরতা ও অর্থগত চাতুর্য এর বাংলা প্রতিশব্দের মাঝে অনুপস্থিত। তাই বাংলায় রচিত ইসলামী সাহিত্যে শব্দগুলো (বেলায়ত, ওলী, আওলিয়া) সরাসরি তাদের আরবীরূপেই ব্যবহার হয়ে আসছে। আর সাধারণ্যে এদের বোধগম্যতার মাত্রাও সমধিক।

আরবী ভাষায় আমরা যখন শব্দমূল (و - ل - ى) পর্যালোচনা করি তখন আমরা দেখি যে, প্রথম পর্যায়ে বেলায়তের 'নৈকট্য' এর অর্থই সামনে আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রাথমিক অর্থ থেকে অপর দুটি অর্থ জন্ম নেয়। একটি হচ্ছে 'বন্ধুত্ব' (الصدق) এবং অপরটি হচ্ছে শাসনকর্তা, দায়িত্বশীল ও প্রভাবক (الحكم وتولى الامر والمدبر) এর ভাব। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাবনার সমষ্টিতে পরবর্তিতে যে অর্থের জন্ম নিচ্ছে তা হচ্ছে সাহায্য (النصرة)।

সূতরাং, সূক্ষাতিসূক্ষ শাব্দিক বিশ্লেষনে ওলী (ولى) মানে যিনি অতি নিকটজন। তিনি বন্ধু, তিনি দায়িত্বশীল। আবার ইবনুল মনজুরের[২] ভাষায় তিনি সাহায্যকারি।

পবিত্র কোরআনে এই শব্দমূল (و - ل - ى) উৎসারিত শব্দাবলী এবং ওলী ও আওলিয়া বিভিন্ন স্থানে নানা অর্থে বর্ণিত হয়েছে। ওলী শব্দটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে এসেছে, "মনে রেখো যারা আল্লাহর ওলী (বন্ধু), তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তার চিন্তান্বিত হবে।"[৩] এই আয়াতে আওলিয়া শব্দটি ইতিবাচক আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিবাচকতার বিষয়টি দুটি কারণে নিশ্চিত। প্রথমত: বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক আল্লাহর সাথে। বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর বন্ধু। দ্বিতীয়ত: এই বন্ধুত্বের ফলাফল হিসেবে বলা হচ্ছে ভয় ও চিন্তাহীন জীবন[৪]।

অপরদিকে, অন্য আয়াতে 'আওলিয়া' শব্দটি নেতিবাচক আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা (মুমিনগন) শয়তানের ওলীদের সাথে যুদ্ধ কর"[৫]। নেতিবাচকতার বিষয়টি স্পষ্ট যেহেতু প্রথমত: ওলীকে শয়তানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত: মুমিনদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হচ্ছে।

সাধারণত: আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে ওলী বা আওলিয়া ইত্যাদি শব্দগুলোকে আমরা ইতিবাচক আঙ্গিকে ব্যবহার করতে এবং ব্যবহৃত হতে দেখতে অভ্যস্ত। ওলী শব্দটি বললে বা শুনলে আমাদের মস্তিষ্ক সয়ংক্রিয়ভাবে এর দ্বারা 'আল্লাহর ওলী' ধরে নিতেই অভ্যস্ত। তবে পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় বিষয়টি ভীন্নভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ওলী ও বেলায়ত সম্পর্কে অধ্যয়নের বেলায় বিষয়টি মাথায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইবনে তাইমিয়া তাসাউফপন্থীদের সমালোচনাকালে এই বিষয়টিকে আশ্রয় করে তার অনেক যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে এই শব্দটির (বেলায়ত) ব্যবহার ও প্রয়োগের বহুমাত্রিকতার প্রভাবে এর অর্থে যে নান্দনিকতা ও ছন্দবদ্ধ পার্থক্য এসেছে তা তাফসিরকারকদের গবেষনার অন্যতম বিষয় হয়ে দাড়িঁয়েছিলো। যেমন, প্রবীন মুফাসসির মুকাতিল পবিত্র কোরাআনের পরিভাষায় ব্যবহৃত 'বেলায়ত' এর দশটি ভীন্ন ভীন্ন অর্থের কথা বলেছেন। এদের প্রত্যেকটিই আবার এই শব্দের (নৈকট্য ও দায়িত্ব) মৌলিক অর্থের সাথে সম্পর্কিত।

ওলী শব্দটির একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুপম বৈশিষ্ট হচ্ছে যে এটা বান্দার সিফাত হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি এটা আল্লাহর আসমাউল হুসনার অন্যতম। পবিত্র কোরআনে এসেছে, "আল্লাহ ঈমানদারদের ওলী, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান"[৬]। অন্য আয়াতে এসেছে, "আল্লাহ মুমিনদের ওলী"[৭]। বেলায়ত পরিণত হয়েছে খালেক ও মাখলুকের সিফাতের মিলনকেন্দ্র।

আরবী শব্দ গঠনগত দৃষ্টিকোণে ওলী (ولى) শব্দটি (فعيل) এর ওযনে (ছাচেঁ) গঠিত। এটি কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য উভয় অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ রাখে। ওলী মানে নৈকট্য লাভ কারী (المقرَّب) যেমন হতে পারে তেমনি নৈকট্য লাভে মধ্যস্থতাকারী (المقرِّب) অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। ওলী মানে সাহায্যকারী (ناصر) ও সাহায্যপ্রাপ্ত (منصور)। সেই হিসেবে তাসাউফের পরিমন্ডলে ওলী মানে যাকে হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন, আবার একই

---

[২] লিসানুল আরব

[৩] ইউনুস: ৬২

[৪] পবিত্র কোরআনের অন্য স্থানে বলা হয়েছে যে, ভয় ও চিন্তা হীন অবস্থা হেদায়ত প্রাপ্তদের জন্য। "অত:পর যে ব্যক্তি আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে তার জন্য কোন ভয় নেই। এবং তিনি কখনও চিন্তান্বিত হবেন না।" (বাকারা: ৩৮)

[৫] নিসা: ৭৬

[৬] বাকারা: ২৫৭

সাথে যিনি আল্লাহর হক্ক আদায় ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। ওলী মানে যিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন (المقرَّب) আবার নৈকট্য লাভে মধ্যস্ততা করেন (المقرِّب)। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত আবার যিনি আল্লাহর সাহায্যে মাখলুকের সাহায্যকারী।

ওলী শব্দের বিপরীতধর্মী সব্যসাচিক উপযোগীতা ও প্রায়োগীক উৎকর্ষতা তাসাউফের গবেষনায় 'বেলায়ত ও ওলী'র মানদন্ড নির্ধারণ এবং তাদের অবস্থান অনুধাবন ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনেকটা নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছে।

'বেলায়ত' এর স্বরূপ সন্ধানে

পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে ওলী, আওলিয়া ইত্যাদি শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও তাসাউফ শাস্ত্রের আঙ্গিকে 'বেলায়ত' এর একাডেমিক ব্যাখ্যা ও সামগ্রীক রূপরেখা প্রনয়নের বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত ঝুলন্ত ছিলো। প্রথম যুগের সূফী গবেষক ও লেখকরা যে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন বা জানতেন না বিষয়টি তা নয়। তাদের লিখনিতে বেলায়ত বিষয়ক ভাবনা অবশ্যই ছিলো। তবে তা ছিলো তাদের বিভিন্ন লিখনিতে ছড়ানো ছিটানো এবং আপাত; দৃষ্টিতে অগভীর। বিশিষ্ট গবেষক ও সূফী লেখক আল-হুজবিরি[৮] (রহ:) এর মতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে প্রথম হাকিম তিরমিযী (রহ:) বেলায়ত বিষয়ে তাসাউফ শাস্ত্রের আঙ্গিকে ব্যপক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোনে গবেষনা করেন। তিনি এই বিষয়ে বেশ কিছু গবেষনা গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাঝে 'খাতমুল আওলিয়া' অন্যতম। ধারনা করা হয় যে তিনি ২৬০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এরপর মাঝখানে দীর্ঘদিন যাবত এই গ্রন্থটি অপ্রকাশিত ও নিখোঁজ ছিলো। ইবনে আরাবী তার বিখ্যাত 'আল ফাতুহাত আল মাকিয়্যায়' গ্রন্থে এই গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন। শতাব্দির পর শতাব্দি ইবনে আরাবীর (রহ:) এই উদ্ধৃতিগুলোই 'খাতমুল আওলিয়া' গ্রন্থ সর্ম্পকে জানার একমাত্র মাধ্যম ছিলো। গত শতাব্দির ষাটের দশকে অনেক অনুসন্ধানের পর ইস্তাম্বুল ও লন্ডনে এর দুটি অনুলিপি পাওয়া যায় যা পরবর্তিতে বিস্তৃত নিরীক্ষণের পর প্রকাশিত হয়।

হাকীম তিরমিযি (রহ:) এর বেলায়তের আনুপার্বিক বিশ্লেষন অনেকটা 'হক্কুল্লাহ'[৯] (حق الله) এর বোধগম্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই 'হক্কুল্লাহ' কে উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে ওলীরও স্তরভেদ হয়। কারণ রুহানী জিন্দেগী দুই স্তরে অনুভব ও চর্চা হয়। প্রথম স্তর আল্লাহ প্রদত্ত জাহেরী ও বাতেনী আহকাম, আদেশ-নিষেধ সমুহকে পরিপূর্ণভাবে পালনের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী আদেশ-নিষেধ বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার অচ্ছেদ্য সর্ম্পকের ভিত্তিভুমি। এই স্তরে ওলীর বেলায়তের গুনজ বিকাশ হয় ইবাদাতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, "আমি মানুষ ও জ্বীনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"।[১০]

দ্বিতীয় স্তরে ওলীর বেলায়তের বিকাশ হয় 'উবুদিয়্যত' (عبودية) এর মাধ্যমে। হাকিম তিরমিযি (রহ:) এর ভাষায় নিখিল বিশ্বের সমস্ত কিছু আল্লাহ তায়ালার দিকে পরিপূর্ণভাবে মুখাপেক্ষি, আর কোন শক্তির অস্তিত্য নেই' এই মহাসত্যকে অন্তর দ্বারা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারাই হচ্ছে 'উবুদিয়্যত'।

ইবাদাত বান্দার ইচ্ছাশক্তির সাথে সম্পর্কিত। তাই প্রথম স্তরে বান্দা তার ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে সজাগ থাকে বিধায় ইচ্ছাশক্তি বিলীনের পরিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় না। আর 'উবুদিয়্যতের' স্তরে বান্দা যেহেতু এই জগতের মুখাপেক্ষিতা অনুভব ও উপলব্ধি (জানা বা দেখা নয়) করেন, তাই তার মাঝে ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতার কোন পরশ অনুভব হয়না। উবুদিয়্যতের স্তরে বান্দা যা করে আল্লাহর জন্যই করে। যা ভাবে আল্লাহকে নিয়েই ভাবে। আল্লাহর দয়াময় অস্তিত্বকেই সর্বদা অনুভব করে। বান্দার স্বত্তায় 'উবুদিয়্যত'র এই বিকাশ বান্দার অন্তরকে খোদায়ী তাজাল্লির বিকাশস্থল হওয়ার যোগ্য করে তোলে। খোদায়ী তাজাল্লির ধারক ও বিকাশস্থল হওয়ার কারনে আওলিয়া কেরামের সাহচর্য্য খোদার সাহচর্য্য হিসেবে গন্য। পবিত্র হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহর ওলী হচ্ছেন তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্বরণ হয়।[১১]

ওলী ও বেলায়তের সংজ্ঞা বা স্বরূপ নির্ধারণে লেখকগন বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করেছেন। তাদের বক্তব্যে অন্তর্মূখী বিভিন্নতা যেমন আছে, তেমনি আছে রহস্যময়তার চাতুর্য।

আবু ইয়াযিদ বোস্তামী (রহ:) এর কথা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আল্লাহর ওলী কোন বিশেষ নিদর্শনে নিজকে বিশেষায়িত করেন না। তার কোন নির্দিষ্ট নামও থাকেনা যে নামে তাকে নামাঙ্কিত করা যায়[১২]। একদা আবু ইয়াযিদ বোস্তামী (রহ:) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, সকালটা আপনার কেমন হলো? (আরবীতে ব্যবহৃত "কেমন আছেন?" এর প্রতিবাক্য)। তিনি বললেন, কোন সকাল-সন্ধা নেই। সকাল-সন্ধাতো ঐ ব্যক্তির জন্য যার আলাদা সিফাত আছে। আর আমারতো কোন সিফাতই নেই।"[১৩] সত্যই, যে ওলী নিজের সিফাতকে সিফাতে রব্বানীর মাঝে বিলীন (ফানা) করে দিয়েছেন তার জন্যতো কোন সকাল-সন্ধা নেই। নিজস্ব কোন সময় নেই। আপন কোন পরিচয় নেই। সকল জাগতিক বন্ধন আর সৌন্দর্যের উর্ধ্বে উঠে তিনি সর্বদা সদা বিরাজমান ঐশী তাজাল্লির রূপে বিভোর।

জুন্নুন মিসরি বলেন, "তারা এমন লোক যাদের রক্তে-মাংসে কোরআন মিশে আছে।[১৪]" তার এই কথাটি আমাদেরকে হযরত আয়েশা (রা:) এর বর্ণিত হাদিস এর কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি (রা:) বলেন, কোরআন ছিল তার চরিত্র। (خلقه القران)। আওলিয়া কেরাম নবীদের উত্তরাধিকারী। উত্তরাধীকার সূত্রেই নবী (স:) এর কাছ থেকে তারা এমন আঙ্গিকে কোরানের চরিত্র লাভ করেছেন যে তাদের রক্ত-মাংসে কোরআন মিশে আছে।

ইমাম কুশায়রী (রহ:) বলেন, ওলী সময়ের সন্তান।[১৫] (الولى ابن وقته) অর্থাৎ ওলীর এমন কোন অতীত নেই যা নিয়ে তিনি হা-হুতাশ করেন। আর তার এমন কোন ভবিষ্যত নেই যা নিয়ে তিনি ভীত বা দুশ্চিন্তা করেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, মনে রেখো যারা আল্লাহর ওলী, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তার চিন্তান্বিত হবে[১৬]।

বেলায়তের প্রকার

উপলব্ধির সুবিদার্থে বেলায়তকে পর্যবেক্ষণের ভীন্ন কৌনিক দৃষ্টিতে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। বেলায়তে ঈমান ও বেলায়তে ইহছান। এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:) বলেন, "বেলায়তে ঈমান শুধুমাত্র খোদার সর্ম্পককে বুঝায়, এই বেলায়ত সমস্ত মোমেনগন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেলায়তে এহছান খোদার নিকটতম রহস্যপূর্ন্য সম্পর্ক ও ক্ষমতাকে বলা হয়। শুধুমাত্র নবী ও অলীগনই ইহা প্রাপ্ত হন"[১৭]। বেলায়তে ঈমানকে অনেক সূফী গবেষক বেলায়তে আম ও বেলায়তে এহছানকে বেলায়তে খাছ হিসেবে উল্লেখ করেছেন[১৮]।

ওলী ও বেলায়তের নিদর্শন

হযরত নাজমউদীন কোবরা (রহ:) বলেন, ওলীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপকার্য ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে হেফাজত করা হবে। তাদের দোয়া কবুল হবে। তারা ইসমে আজমের জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি বলেন, "আধ্যাত্মিক সাধককে তখনই বেলায়তের অধিকারী বলা যাবে যখন তাকে 'কুন' (كن) দান করা হবে"[১৯]। আল্লাহ

---

[১১] هم الذين يذكر الله عند رؤيتهم

[১২] তবকাত আস সূফীয়্যাহ, সুলমা পৃ: ১০৩

[১৩] শাতাহাত ছুফিয়্যাহ, আবদুর রহমান বাদাবি পৃ: ৭০

[১৪] হুলিয়্যাতুল আওলিয়া, আবু নাঈম ইস্পাহানী, পৃ: ১৪

[১৫] রিসালাহ আল কুশায়রী, পৃ: ১১৭

[১৬] ইউনুস: ৬২

[১৭] বেলায়তে মোতলাকা: পৃ ২

[১৮] কালাবাজী পৃ: ৭০

[১৯] ফাওয়ায়েহুল জামাল ওয়া ফাওয়াতেহুল জালাল, নাজম উদ্দীন কোবরা পৃ: ৮২

তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,"আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি; তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও, সুতরাং তা হয়ে যায়। (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)[২০]।

বান্দার আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত 'কুন' (كن) শব্দের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি আপাত: দৃষ্টিতে আল্লাহতায়ালার একত্ববাদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হলেও তা মুলত: পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফেরই মর্মবাণীর ভাষান্তর। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন ইচ্ছা পোষন করবে না, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞময়। (وما تشاؤون الا ان يشاء الله)[২১]। ওলী যখন তার আপন এরাদাকে আল্লাহর এরাদাতে বিলীন করে দেন তখন তার এরাদা মুলত: খোদায়ী এরাদার প্রতিচ্ছবি হিসেবে গন্য হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, যার মাঝে তিনটি গুন থাকবে সে আল্লাহর বেলায়তের হকদার হবে। ধৈর্য্য (উদারতা), যা দ্বারা তিনি বোকার বোকামী প্রতিহত করেন। সত্যিকার পরহেযগারী, যা তাকে হারাম থেকে বাধা দেয়। সৎ চরিত্র যা দিয়ে তিনি মানুষকে সন্তুষ্ট করেন[২২]।

বেলায়তের বিষয়টি মৌলিকভাবে নবুয়তের সাথে সম্পর্কিত। নবুয়তের সাথে এর সম্পর্কের পটভুমি ও আঙ্গিক অনুধাবন না হলে বেলায়তের সার্বিক রূপরেখা অঙ্কন করা দু:সাধ্য।

নবুয়ত

নবুয়ত শব্দটি আরবী আন নাবুওওয়াহ (النبوة) এর পরিবর্তিত উচ্চারণ। শব্দটি 'নাবা' (نبأ) শব্দমুল উৎসারিত। এর অর্থ হচ্ছে সংবাদ দান করা। নবী (نبى) অর্থ সংবাদ বাহক। নবুয়তের ব্যাখ্যায় হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহ:) বলেন, "খোদাতায়ালার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কীত মধ্যস্থতায় নবুয়তকে শ্রেষ্ঠতর নৈকট্যপূর্ণ মানবতা বলা যাইতে পারে।"[২৩]

নবুয়ত ও বেলায়ত এর সর্ম্পক

হযরত আব্দুল কাদের জীলানি (রহ:) বলেন, "বেলায়ত হচ্ছে নবুয়তের ছায়া। আর নবুয়ত হচ্ছে ইলাহিয়াতের ছায়া"[২৪]। হযরত গওসুল আজম (রহ:) এই ছোট বাক্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন নবুয়ত ও বেলায়তের মাঝের অচ্ছেদ্য সর্ম্পকের উপর জোরারোপ করেছেন। তেমনি অপরদিকে বেলায়তের উৎসের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বেলায়ত ও নবুয়তের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষনে যে ঐশী বাণীকে ভিত্তিভুমি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা হচ্ছে হযরত রাসুল (স:) এর বাণী; জ্ঞানীগন নবীদের উত্তরাধীকারী (العلماء ورثة الانبياء)[২৫]। আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত জ্ঞানী বলতে আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানীই উদ্দেশ্য। নবী বলতে শুধু আখেরী নবী হযরত রাসুল (স:) এর উদ্দেশ্য নয়। বরং সকল নবী-রাসুলই উদ্দেশ্য। তাই সূফী গবেষকদের মতে হাদীসানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ রাসুল (স:) এর উম্মতের আল্লাহ প্রদত্ত এক অনুপম বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, তারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) সহ পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুলদের কাছ থেকে বেলায়তের ফয়েজ লাভ করে থাকেন। এক্ষেত্রে অন্য এক হাদীসে রাসূল (স:) -এ বলা হয়েছে, "আমার উম্মতের মাঝে এমন ব্যক্তি আছে যার কলব মুছ (আ:) এর কলবের উপর রয়েছে। এমন ব্যক্তি রয়েছে যার কলব ঈসার (আ:) কলবের উপর রয়েছে। এমন ব্যক্তি রয়েছে যার কলব ইবরাহীম (আ:) এর কলবের উপর রয়েছে"[২৬]। সংশ্লিষ্ট নবীর মশরব অনুযায়ী ওলীর মশরবের মাঝেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। যেমন কেউ যদি হযরত মুছা (আ:) এর বেলায়তের ফয়েজ লাভ করেন তবে সেই ওলীর মাঝে মুছভী বেলায়তের প্রভাব পরিদৃষ্ট হবে। আর কেউ যদি হযরত খিযির (আ:) এর কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করে থাকেন তবে সেই ওলী আচার-আচরণের মাঝে খিযিরি রহস্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। তবে যে ওলী যে নবীর ফয়েজ লাভ করুন না কেন, সবাই তাদের ফয়েজ একমাত্র শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর উসিলায় ও মাধ্যমে লাভ করে থাকেন।

এই বিষয়ে হযরত ইবনে আরাবী (রহ:) এর 'ফছুছুল হেকম' গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই গ্রন্থটি হযরত ইবনে আরাবীর (রহ:) জীবনের শেষ সময়ে রচিত। এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে বর্ণিত বক্তব্যানুযায়ী ইবনে আরাবী (রহ:) গ্রন্থটি স্বপ্নযোগে হযরত রাসূল (স:) এর বিশেষ নির্দেশে ও তার নির্দেশনানুযায়ী লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটি একটি প্রারম্ভিকা ও সাতাশটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে কোন একজন নবীর জাতের প্রতি বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ ইঙ্গিতের মাধ্যমে লেখক তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে হযরত আদম (আ:) ও শেষ অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রতি ইশারা রয়েছে। এই গ্রন্থের অধ্যায়ের ক্রমধারা নির্ধারন ও নবীদের কথা উল্লেখের সময় ইবনে আরাবী (রহ:) সংশ্লিষ্ট নবীদের সময়ের ক্রমধারাকে অনুসরণ করেননি। যেমন, হযরত ঈসার (আ:) কথা হযরত সোলাইমান (আ:) এর পূর্বে এসেছে। একইভাবে হযরত দাউদ (আ:) এর কথা এসেছে হযরত সোলাইমানের (আ:) পর। তিনি দুটি আলাদা অধ্যায়ে হযরত শীশ (আ:) ও খালেদ বিন সিনান এর কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও নবী হিসেবে এই দুজনের কথা কোরআনে আসেনি। অন্যদিকে তিনি কোরআনে উল্লেখিত দুজন নবীর ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নীরব থেকেছেন। তারা হলেন, হযরত জুল কিফল ও হযরত ইউনুস (আ:)[২৭]।

আরবীতে ফছ্ (فص) শব্দটি বলা হয়- আংটির উপরের যে অংশে অলংকারিক পাথর থাকে। অর্থ্যাৎ এই অংশটি তুলনামুলকভাবে বেশি দৃশ্যমান, প্রস্ফুটিত ও গুরুত্বপূর্ণ। ইবনে আরাবী (রহ:) তার এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শিরোনাম আরম্ভ করেছেন এই ফছ্ (فص) শব্দ দ্বারা। এরপর শিরোনামে সংশ্লিষ্ট নবীর (আ:) নাম সহযোগে 'হেকমত' ও 'কালেমা' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শিরোনামে প্রায় কাছাকাছি পদ্ধতি অনুসরন করেছেন। যেমন, 'ফাচ্ছু হিকমাতিন ইলাহিয়্যা ফি কালিমাতিন আদমিয়্যাহ'[২৮], 'ফাচ্ছু হিকমাতিন নাফসিয়্যাহ ফি কালিমাতিন শীশীয়্যাহ'[২৯], 'ফাচ্ছু হিকমাতিন কালবিয়্যাহ ফি কালিমাতিন শোয়াইবিয়্যাহ'[৩০]। এইভাবে তিনি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার এক অনুপম চিত্র অংকন করেছেন। এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনি আল্লাহর তাজাল্লিয়্যাতির ঐশী প্রকাশধারা ও তাকে গ্রহনকারী উৎকৃষ্ট মানবতার শ্রেষ্ঠরূপের মিলনকেন্দ্রের উপর আলোকপাত করেছেন। কখনোবা রূপকভাবে কখনোবা সরাসরি বর্ণনা করেছেন মাজহারে তাজাল্লিয়্যাতে ইলাহির রূপান্তর-সৃষ্ট বৈশিষ্ট ও প্রভাবকে। আনুপার্বিক বিশ্লেষণে এটা নিশ্চিত যে, হযরত ইবনে আরাবী (রহ:) তার গ্রন্থকে যেভাবে সাজিয়েছেন তা এই বইয়ের অলংকারিক বা ভাষাগত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়। মুলত: তিনি (রহ:) এই বইয়ে হাকিকতে বেলায়তের স্বরূপ উন্মোচন ও তাকে উপলব্ধির একটি জাহেরী অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন।

হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:) তার রচিত বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থে 'নবীয়ে ছালাছা' পরিচ্ছেদে হযরত ইব্রাহিম (আ:), হযরত ঈসা (আ:) ও হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নবুয়তের অবস্থার কথা বর্ণনা করে তাদের মশরবের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন[৩১]; যা নবুয়ত ও বেলায়তের মাঝের উৎস সম্মন্ধীয় অচ্ছেদ্য সর্ম্পকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার এই পরিচ্ছেদ অধ্যয়নে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে, তিনিও নবীদের নবুয়তের বৈশিষ্টকে অবলম্বন করে হাকিকতে বেলায়তকে উপলব্ধির জন্য একটি জাহেরী অবকাঠামো নির্মান করেছেন। তবে ইবনে আরাবীর প্রতিতুলনায় তিনি তা অত্যন্ত সংক্ষেপে করেছেন। তার এই অবকাঠামো অনেকটা পানিতে ভাসা বরফ খন্ডের (আইসবার্গ) সাথে তুলনীয়। দৃশ্যমান অংশের চাইতে দৃশ্যত: লুকায়িত অংশই বেশী।

নবুয়ত ও বেলায়ত তিনটি বিষয়ে প্রায় ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমত: নবুয়ত ও বেলায়ত এর জ্ঞান জাহেরী জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অর্জন হয়না। নবুয়ত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। এটা অধ্যয়ন করা যায়না। বেলায়তও

---

[২০] নাহল ৪০

[২১] ইনসান, ৩০

[২২] ইবনে আবি দুনয়া, আওলিয়া, পৃ: ৪৮

[২৩] বেলায়তে মোতলাকা পৃ: ১

[২৭] হযরত ইউনুস ও হযরত জুল কিফল (আ:) এর ব্যাপারে হযরত ইবনে আরাবী (রহ:) রহস্যজনকভাবে নীরব থাকলেও একথা মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, এই দুই জন নবীর কাছে বেলায়ত ছিলোনা বা তাদের প্রতি ইবনে আরাবী (রহ:) অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

[২৮] فص حكمة الهية فى كلمة آدمية

[২৯] فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية

[৩০] فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبية

[৩১] বেলায়তে মোতলাকা. প: ৫

অধ্যয়ন বা ইত্যাদি মাধ্যমে অর্জিত হয়না। এটাও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দান হিসেব আসে। দ্বিতীয়তঃ কার্যক্ষেত্রে নবুয়ত ও বেলায়তি সূক্ষ-শক্তির মাধ্যমে এমন কাজ সম্পাদন হয় যা স্থুল শারিরীক শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়না। তৃতীয়তঃ নবুয়ত ও বেলায়তী শক্তির অধিকারী স্বত্তা তার জাহেরী স্থুল ইন্দ্রীয় দ্বারা অতীন্দ্রীয় বা সূক্ষ জগতের দৃশ্য অবলোকনে সমর্থ থাকেন[৩২]।

এখানে আমরা হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ:) এর বক্তব্য স্বরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন, বেলায়ত নবুয়তের ছায়া। কায়া ও ছায়ার মাঝে আকৃতিগত মিল থাকা স্বাভাবিক। তবে বস্তুর হাকিকত বিবেচনায় কায়া ও তার ছায়া কখনোই এক নয়। বেলায়ত ও নবুয়তের ক্ষেত্রেও তা সত্য। যেমন, নবীদের রুহানী উৎকর্ষতা ও মরতবা এবং ওলীদের রূহানী উৎকর্ষতার মাঝে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। নবীদের রুহানী উৎকর্ষতা হয় নুরে আছলীর মাধ্যমে আর ওলীদের রুহানী উৎকর্ষতা লাভ হয় নুরে আছলী উৎসারিত ফয়েজের মাধ্যমে।

হাকিকতে মুহাম্মদী

সমস্ত নবী-রাসুল হযরত রাসুল (স:) এর পবিত্র জাত থেকে তাদের ফয়েজ অর্জন করেন। এবং এরই ধারাবাহিকতায় আওলিয়াগনও হযরত রাসুল (স:) পবিত্র জাত থেকে মেহেরবাণী ও ফয়েজ পেয়ে থাকেন। এই ফয়েজ ও মেহেরবাণীরই অন্যরূপ বেলায়ত। হাকিকতে মুহাম্মদীর সংক্ষিপ্ত মূল বিশ্বাস হচ্ছে যে, হযরত রাসুল (স:) ৫৭০ খ্রী: মানবীয় ছুরতে এই ধরাধামে আগমন করলেও তার পবিত্র হাকিকত এই জগত সৃষ্টির পূর্বেও বর্তমান ছিলেন। তার নৈকট্য সর্বোচ্চ স্তরের নৈকট্য। যাকে পবিত্র কোরআনের ভাষায় কাবা কাওসাইন[৩৩] বলা হয়েছে। হাকিকতে মুহাম্মদীর এই ধারনা ও বিশ্বাস রাসুল (স:) এর একটি হাদীস থেকেই গৃহীত। নবী করিম (স:) এরশাদ করেন, আদম যখন মাটি ও পানিতে মিশ্রিত ছিলো তখনও আমি নবী ছিলাম[৩৪]। সমার্থক আরও অনেক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) রেওয়াত করেন, আল্লাহর রাসুলকে (স:) প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনি কখন নবী হয়েছিলেন? তিনি (স:) বলেন, যখন আদম রুহ ও শরীরের মধ্যবর্তি অবস্থায় ছিলো। (অর্থ্যাৎ যখন হযরত আদম (আ:) কে সৃষ্টি করা হয় নাই।)

'হাকিকতে মুহাম্মদী' এই পরিভাষাটি আক্ষরিক দৃষ্টিকোনে ইসলাম ধর্মের প্রথম যুগে ব্যবহার হয় নাই। বরং পরবর্তি যুগের সূফী গবেষকগন তাদের লিখনিতে এই পরিভাষা ব্যবহার করেন। ফলশ্রুতিতে অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন যে এটা একটি বিদআত বা অনৈসলামিক পরিভাষা। আরও অনেক বিদআতি পরিভাষা, আক্বিদা ও কাজের মতো তা ইসলামী সমাজ ও জ্ঞানের পরিমন্ডলে অনুপ্রবেশ করেছে। 'হাকিকতে মুহাম্মদী'র পরিভাষাটি মুলত: ইসলামের প্রথম যুগে অতি চর্চিত, কোরআন ও হাদিস উৎসারিত অন্য একটি ইসলামি পরিভাষারই প্রতিরূপ। 'নুরে মুহাম্মদী'র পরিভাষাটি যে অর্থে ব্যবহৃত ও চর্চিত 'হাকিকতে মুহাম্মদি'র পরিভাষাটিও এর কাছাকাছি অর্থ ধারন করে।

'নুরে মুহাম্মদী'র ধারনা সরাসরী একাধিক কোরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসুল (স:) দ্বারা প্রমানিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে রাসুলের (স:) সম্মন্ধে বলেছেন যে তিনি ছিরাজাম মুনিরা। (سراجا منيرا)[৩৫] সূরা মায়েদায় এসেছে, "তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'নূর' ও স্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে"। (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين[৩৬])। এই আয়াত সমুহে মুফাসসিরদের মতে 'নুর' হচ্ছে হযরত রাসুল (স:)।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা:) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসুল্লাহ (স:) কে বললাম, আমার মা বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক। সবার আগে আল্লাহ তায়ালা যে বস্তু সৃষ্টি তা আমাকে বলুন। তিনি (স:) বলেন, জাবের! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছুর আগে তার নুর থেকে তোমার নবীর নুর সৃষ্টি করেছেন[৩৭]।

---

[৩২] রিসালাতুল আনওয়ার, ইবনে আরাবী পৃ ১৫

[৩৩] قاب قوسين او ادنى নাজম, ৯

قلت يا رسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اول شيئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره

বেলায়তের স্তর

ইবনে আরাবী (রহ:) বলেন, আওলিয়াদের স্তর দুই প্রকার। স্থুল স্তর ও সূক্ষ স্তর। স্থুল স্তর একশ দশটির অধিক স্তরে বিন্যস্ত। বেলায়তের সূক্ষ স্তর দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজারেরও অধিক স্তরে বিন্যস্ত। এই স্তরগুলো আবার চারটি মাকামে বিন্যস্ত।

১. মাকামে ইলমে লাদুন্নী
২. মাকামে ইলমে নুর
৩. মাকামে ইলমে জমআ ওয়া তাফরিকা
৪. মাকামে ইলমে কিতাবাত আল ইলাহিয়্যা[৩৮]

অন্যদিকে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:) বেলায়তকে তিনস্তরে বর্ণনা করেছেন।

১. বেলায়তে ছোগরাঃ (নিম্ন স্তরেরর বেলায়ত) যারা বেলায়তী ক্ষমতা লাভে সাধারণ মোমেনের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছেন।
২. বেলায়তে ওছতাঃ (মধ্যম স্তরের বেলায়ত) যারা বেলায়তি ক্ষমতায় ফেরেশতার মাকামের উপর স্থান লাভ করেছেন।
৩. বেলায়তে ওজমা: (সর্বোচ্চ স্তরের বেলায়ত) যারা বেলায়ত অর্জনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই স্তরের ওলীগন সৃষ্ট জগতে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম থাকেন।[৩৯]

গাওস-কুতুব বিষয়ক বক্তব্য ও এর সমালোচনা

বেলায়ত সংশ্লিষ্ট আলোচনার একটি আবশ্যকীয় অংশ ওলীদের স্তরভেদ ও এই সব স্তরের নামকরণ। সূফী আলোচনায় বেলায়তের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা এসেছে এবং এসব স্তরের অধীকারী ব্যক্তিদের পদবিও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, গাওস, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, নোকাবা ইত্যাদি। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক পদের নাম এবং এদের দায়িত্ব ও অস্তিত্য বিষয়ক আলোচনা সূফী বিরোধীদের সমালোচনা ও আক্রমনের জনপ্রিয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সূফীবাদের বিজ্ঞ সমালোচকগন সাধারণত: দুই পন্থায় এই সব বিষয়ের সমালোচনা করেন।

প্রথমত: ঢালাওভাবে এসব বিষয়কে কুসংস্কার, বেদাত, ইসলাম বিরোধী, অনুপ্রবিষ্ট অন্য ধর্মের আক্বিদা-বিশ্বাস ইত্যাদি বলে বাতিল করে দেন। এবং জোর গলায় নিশ্চয়তা দেন যে হাদীসে এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়তঃ এসব বিষয়ের পক্ষে তাসাউফ গবেষকদের উপস্থাপিত হাদিস সমুহকে ঢালাওভাবে এক কথায় জাল, দূর্বল, জয়ীফ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করে বাতিল করে দেন।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা ও রচনায় সময় স্বল্পতার কারনে এই সংক্রান্ত সব হাদিস আনুপার্বিক বিশ্লেষণপূর্বক উল্লেখের ইচ্ছা ও লোভকে সামাল দিতে হচ্ছে। কমপক্ষে মোট ১৪ সাহাবী ভীন্ন ভীন্ন সনদে আবদাল সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসগুলোর বাক্য বিন্যাস, তথ্য ও রেওয়ায়েত পদ্ধতিতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও মোদ্দা কথা হচ্ছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে হাদীস রয়েছে। এইসব হাদীসের রেওয়ায়েত কারীদের মাঝে হযরত ওমর (রা:), হযরত আলী (রা:), হযরত আনাস (রা:), হযরত হুযায়ফা (রা:), হযরত উবাদা বিন ছামেত (রা:), হযরত ইবনে আব্বাস (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:), হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রা:), হযরত ওয়াছিলা বিন আল আছকা (রা:), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:), হযরত আবু হোরায়রা (রা:), হযরত আবু দারাআ (রা:), হযরত উম্মে সালমা (রা:) উল্লেখযোগ্য।

---

[৩৮] ফতুহাত আল মাকিয়্যাহ

[৩৯] বেলায়তে মোতলাকা: পৃ: ৪

উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদিস উল্লেখ করছি। হযরত উবাদা বিন ছামেত (রা:) বলেন, "রাসুল (স:) বলেন, আমার উম্মতের মাঝে আবদাল হবেন ত্রিশজন; ইবরাহিম (আ:) খলিলির রাহমান এর মতো"[৪০]

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ:) তার হাদীসগ্রন্থে এই হাদিসটিসহ সমার্থক আরো কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ:) এর রেওয়ায়েতকৃত হাদিস উল্লেখের একটি বিশেষ কারন রয়েছে। বর্তমান সময়ে যারা এই বিষয়ে সমালোচনায় মত্ত তারা নিজেদের সাধারণত: হাম্বলী হিসেব পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাদের মজহাবের ইমামের রেওয়ায়েতকৃত একাধিক হাদিস তারা এক কথায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না, এতটুকু ভদ্রতা অন্তত তাদের কাছে আশা করতে দোষ নেই।

দ্বিতীয়তঃ কুতুব, আবদাল সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মাঝে সহীহ, হাসান, জয়ীফ নানা প্রকারের হাদীস রয়েছে। তাদের পর্যালোচনাও সে অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। ঢালাওভাবে জয়ীফ বলা একডেমিকভাবে গ্রহনযোগ্য নয়।

পবিত্র হাদিস ও সূফী সাধকদের কাশফ অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমরা আধ্যাত্মিক জগতে যে সমস্ত পদ বা স্তর সম্পর্কে অবগত হই; ১. গাউসুল আজম, তিনি ফারদুল আফরাদ ২. আওতাদ ৩. আবদাল ৪. নুকাবা ৫. নুজাবা ৬. আখয়ার ৭. মুফরাদ ৮. সালেহীন

বর্ণিত স্তর ও পদের নাম ছাড়াও সূফী লেখক গন আরও অনেক পদ ও দায়িত্বের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কারামাত

কালাম শাস্ত্রে 'কারামাত' এর সত্যতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সেখানে কারামাত অস্বীকারকারীর হুকুমও বিস্তারিত বলা হয়েছে। সূফী গবেষকগন মত প্রকাশ করেছেন যে ওলীর মাধ্যমে প্রকাশিত কারামাত বা অলৌকিক কাজ মুলত নবীর নবুয়তের অনুসরণের দলীল। ওলীর কারামাত কোন অবস্থাতেই নবীর নবুয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং তা নবীর মোজেজার অংশ। ইবনুল ফারেদ (রহ:) বলেন,[৪১]

وما كان منهم معجزا صار بعده- كرامة صديق له او خليفة
بعترته استغنت عن الرسل الورى – واصحابه والتابعين الأئمة

অর্থ্যাৎ: নবীদের জন্য যা ছিলো মোজেজা, তাই তাদের পরে তাদের খলিফ ও ছিদ্দিকের জন্য কারামাতে পরিণত হয়েছে। তার (স:) আহলে বায়ত, সাহাবীগন, তাবেয়ীগন ও ইমামদের বদৌলতে রাসূলদের নির্ধারিত কাজের আনজাম হচ্ছে।

উপসংহার

হযরত মুহাম্মদ (স:) এর তিরোধানের পর থেকে নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।তার পর আর কোন নবী নেই। খোদাতায়ালার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত মধ্যস্থতার এই ঐশী দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবে হযরত রাসূল (স:) এর স্বত্তায় বিকশিত অপর রূপ বেলায়তে এহছান এখনও জারী আছে। তার (স:) রুহানী উত্তরাধীকারী ওলী-আবদাল, গাউস-কুতুব গন খোদা মিলনে ব্যাকুল অন্তরসমুহকে তাদের উদ্দীষ্ট স্থানে (মনজিলে মাকছুদ) পৌছিয়ে দিচ্ছেন। হাদীসের মর্মানুযায়ী তাদেরই মাধ্যমে পৃথিবীর শৃংখলা বিধান করা হয়। তাদেরই উসিলায় নাছুতি জগতস্থ পথহারা মানবের ফরিয়াদ পরম করুনাময়ের দরবারে গৃহীত হয়। তারাই লাহুত ও নাছুতের সংযোগ সেতু।

সমাপ্ত

গ্রন্থসুত্র

আবু আব্দুর রহমান সুলমা, তাবাক্বাত সুফিয়্যা, দারুল কুতুব ইলমিয়্যা, বৈরূত, ২০০৩।

আবদুল ওহাব শারানী, রদউল ফোকারা আন দাওয়া বেলায়তেল কোবরা, দার জাওয়ামিউল কালিম, মিসর।

আবু নাঈম ইস্পাহানী, হুলিয়্যাতুল আওলিয়া, দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরূত, ২০০৬।

আবদুর রহমান বাদাবি, শাতাহাত ছুফিয়্যাহ, ওকালাতুল মাতবুআত, কুয়েত, ২০০১।

আলি বিন উসমান আল জুল্লাবী আল হুজবিরি, কাশফুল মাহজুব, অনু: ড: ইছআদ আবদুল হাদী কিনদিল, মাজলিস আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়্যা, মিসর, ১৯৭৪।

আলী শুদ কিফিতশ, আল বেলায়াত ওয়ান্নাবুয়্যাহ ইনদা ইবনে আরাবী, দারুশ শুরূক, মিসর, ২০০৪।

ঈসা আবদুল কাদের, *হাকায়েক আন তাসাউফ*, দারুল ইরফান, হালব (সিরিয়া), ১৯৯৩।

নাজম উদ্দীন কোবরা, ফাওয়ায়েহুল জামাল ওয়া ফাওয়াতেহুল জালাল, দার ছুয়াদ ছাবাহ, কায়রো, ১৯৯৩।

মহি উদ্দীন ইবনুল আরাবী, ফছুছুল হেকম, দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরূত।

ইবনুল আরাবী, তাজাল্লিয়াত আল ইলাহিয়্যা, মারকাজ নশরে দানশগাহী, তেহরান, ১৯৮৮।

ইবনুল আরাবী, আল ফাতুহাত আল মাকিয়্যাহ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, ২০০২।

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, *সাহীহ মুসলিম*, দার ইহইয়া তুরাছ আল আরবী, বৈরূত (লেবানন) ২০০১।

মুহাম্মদ জাকি ইবরাহিম, উসুলুল বুসুল, দার নোবার, মিসর, ২০০৫।

যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ আল আনসারি, *নাতায়েজুল আফকার আল কুদছিয়্যা*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরূত ২০০০।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম ১৯৬৭।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *বেলায়তে মোতলাকা*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৭৪।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, পঞ্চম সংস্করণ, চট্টগ্রাম ২০১১।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *মানব সভ্যতা*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮।

মজমুয়া রাসায়েল ইবনে আবি দুনিয়া, মাকতাবাত আল আজহারিয়্যা, মিসর, ১৯৭৮।